মকবুলা মনজুর সত্তার গভীরে যার সংগ্রামী চেতনা

আনিস রহমান

আলাপচারিতা হতে পারত দ্বিপক্ষীয়। তা-ই হওয়ার কথা; কিন্তু ঘটনাক্রমে তা হলো ত্রিপক্ষীয়। তৃতীয় মাত্রা পেল কেমন করে যেন! কথা হচ্ছিল মকবুলা মনজুরের সঙ্গে। অনেক জট উঁচিয়ে যখন পৌঁছেছি উত্তরায় তখন রাত। পথঘাট সুনসান। মাঝে মধ্যে পথ লাগোয়া অস্থায়ী বাজার। সেখানে টিম টিম করে জ্বলছে কুপি, না হয় হ্যারিকেন। মকবুলা মনজুর বললেন, বিদ্যুৎ বিভ্রাট এখানে স্থায়ী সমস্যা। তাই রাত করে কাউকে আসতে বলি না। তখন কেউ এলে কিংবা যাওয়ার সময় বাতি ধরো, মোম ধরো, টর্চ জ্বালো– নানান হ্যাপা। আজও কখন বাতি চলে যায়, আশঙ্কা তার চোখেমুখে।

তিনটি মানুষের তিনটে মন, তিনটে মনের তিনটে চিন্তাধারা মিলে কখনো আমরা বর্তমানে, কখনো অতীতে, কখনো বা দূর অতীতে এবং ভবিষ্যতের পথে হাঁটছিলাম কথার মালা গেঁথে গেঁথে।

হারানো শৈশবকে ফিরে ফিরে দেখা। শৈশবের অলি-গলিতে জীবনের ছড়ানো নানান মণিমুক্তো খুঁজে পেতে কার না ভালো লাগে! শৈশবের সঙ্গে আজও গাঁটছড়া মকবুলা মনজুরের। প্রায় ৫৫ বছরের পেছনে যে শৈশব তা সজীব, তাজা এবং সবুজ তার কাছে। সে সময়ের টুকরো টুকরো অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। তাড়া করে ফেরে নিরন্তর। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কালনায় জন্ম তার। ১৯৪৫ সালের দিকে চলে আসেন বগুড়ায়। তখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। মুকুল ফৌজ করতেন। সে সময়ই মকুলের মাহফিলে ছড়া ছাপা হয়। স্কুল থেকে হাতে লেখা পত্রিকা বের হতো। তাতেও লিখতেন। কবিতাই লিখতেন তখন। ১৯৪৭ কিংবা ১৯৪৮ সালের কথা। মুকুল ফৌজের এক অনুষ্ঠানে ছোটদের একটি গল্প পড়েন। গল্পটির ভীষণ প্রশংসা করেন পটুয়া কামরুল হাসান। তাই বুঝি ধীরে ধীরে কবিতার দুয়ার ছেড়ে সখ্য গড়ে তোলেন গদ্যের সঙ্গে। মানুষের মনে যখন রঙ ছড়ায়, স্বপ্নীল ঘোর যখন রোমান্টিক করে তোলে– চারপাশের সব কিছুই ভালো লাগে অর্থাৎ আধেক চেনা, আধেক অচেনা সেই ১৮ বছর বয়স থেকেই কেন যেন কবিতা থেকে দূরে সরে গেলেন। কবিতা আর লেখা হয়নি। গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী– এক কথায় গদ্যের সঙ্গেই সব হৃদ্যতা-কথকতা।

পাকিস্তান সৃষ্টির ঘোষণা হতেই মুকুল ফৌজ মার্চপাস্টের আয়োজন করে। ভীষণ আনন্দে কাটে সেদিনটি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে অংশ নিই। তবে আনন্দটা ছিল খণ্ডিত। বিষাদময় ছিল অনেকের কাছে। সেই বিষাদ ধরার মতো বড় ছিলাম না তখন। আনন্দটাই ছিল মুখ্য। জায়গাটা ছোট ছিল বগুড়া। তাই পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা হিন্দু ধর্মের ছিলেন

তারা ছিলেন চুপচাপ। তবে বেচে-কিনে চলে যাচ্ছেন এমনটি দেখিনি। যারা সরকারি চাকুরে ছিলেন তারা অপশন দিয়ে ভারত চলে গেছেন।

সে সময় নিজের স্কুল ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলে নাটক-আবৃত্তি– এমন সব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন মকবুলা মনজুর। সে সময় বাম রাজনীতির সমর্থক স্টুডেন্ট ফেডারেশন খুব জোরদার ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির জুনিয়র শাখা ছিল এটি। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে বগুড়া ছেড়ে নওগাঁয় আসেন তিনি। তবে ভাষা আন্দোলনের উত্তাপ দেখে আসেন সেখানে। নওগাঁতেও বাম রাজনীতির ধারা ছিল বেশ শক্তিশালী। সে সময়ের শিক্ষক রেখাদির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন মকবুলা। বাম রাজনীতিতে ভীষণ সক্রিয় ছিলেন রেখাদি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী স্কুলের শিক্ষার্থী তিনি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থিনী। তাই বলে পিছিয়ে থাকেননি। ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন জোরালোভাবে। তখন কয়েক ঘণ্টার নোটিশে হোস্টেল থেকে বের করে দেয়া হয়। বাবা তখন সিরাজগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে। স্কুলের বড়দি বিশেষ ব্যবস্থায় লোক দিয়ে বাবা-মায়ের কাছে পাঠান তাকে। একদিকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলেও পড়ালেখায় ছাড় দেননি তিনি। তাই দূরের সেই স্মৃতিকে আজলা ভরে তুলে ধরেন সামনে। বলেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় প্রথম স্থান পেলাম। সে সঙ্গে পেলাম বাংলায় লেটার মার্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও অর্জন করেন তিনি বাংলায়।

ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশ ভাগের আগে ধর্মীয় বিভেদ লক্ষ্য করেছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তার অশুভ ছায়া দেখেছি। কিন্তু ভারত ভাগের পর 'বিভেদ' যথারীতি থাকল, কেবল তার বৈশিষ্ট্যের বদল ঘটল অর্থাৎ ধর্মীয় বিভেদের পরিবর্তে ভাষার বিভেদ মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। উর্দুভাষীদের দৌরাত্ম্যে সব জায়গায় ছিলাম কোণঠাসা এবং তখনি এ দেশের আপামর মানুষের মনে একটি নতুন চেতনা প্রবাহিত হলো– 'আলাদা কিছু চাই'। ভাষা আন্দোলন সে প্রত্যয়কে জাগিয়ে দিল এবং মাথা সোজা করে দাঁড়ানোর সাহস জোগাল। ভাষা আন্দোলনের প্রভাব সে সময় আমাদের সমাজে কত ব্যাপক ছিল তা কেবল যারা দেখেছে তারা উপলব্ধি করতে পারবে। কারণ তখন সব ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হতো বাংলা নাটক মঞ্চায়ন, বাংলা গানের আয়োজন, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালন, সুকান্তের কবিতা আবৃত্তি অর্থাৎ বাঙালি চেতনাকে যথাসম্ভব সজাগ ও সজীব রাখার চেষ্টা আমাদের মধ্যে ছিল প্রতিনিয়ত। ছড়াকার ফয়েজ আহমদ সে সময় 'হুল্লোড়' নামে ছোটদের একটি পত্রিকা বের করতেন। একবার পটুয়া কামরুল হাসানের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে গল্প চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন ফয়েজ আহমদ। সেসব স্মৃতিকে স্মরণ করে মকবুলা মনজুর বলেন, আমার লেখালেখির জীবনে শিল্পী কামরুল হাসান এবং সাহিত্যিক ফয়েজ আহমদের প্রেরণা অনেকখানি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার দারুণ এক সংগ্রামী চেতনা আছে। সব অবস্থাতে যুদ্ধ করি– ফিরে এসে দাঁড়াতে চাই। আমার আজকের এ অবস্থানে এসে দাঁড়াতে সেই সংগ্রামী চেতনা খুব বড় একটা নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। এতে বাবার সমর্থন ছিল। যদিও তিনি পুলিশ অফিসার ছিলেন; কিন্তু ভালো লিখতেন। এছাড়া ঘর-সংসার, চাকরি, সন্তানদের লালন-পালন– এত সংগ্রামের পর বিবাহিত জীবনে স্বামী মনজুর হোসেনের আকণ্ঠ সমর্থন-সাহায্য পেয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে মকবুলা মনজুর বলেন, অনেক সময় আমার বড় বড় লেখা তিনি কার্বনে কপি করে দিয়েছেন। সংসার, সাহিত্য চর্চাসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে যাতে ভেঙে না পড়ি, হেরে না যাই সে জন্য সব সময় প্রবল প্রেরণা জুগিয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যার ভেতরে প্রতিভা আছে তাকে থামিয়ে দেয়া যায় না। মানুষের ভেতরে স্রষ্টা এমন কিছু দিয়েছেন যার শক্তিতে তাকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেয়া হয়। এরই রেশ ধরে মকবুলা মনজুর বলেন, তাদের প্রেরণা, অবদান, উৎসাহ আমার অর্জনের পথে আলো-বাতাস জুগিয়েছে ঠিকই কিন্তু মাটি হচ্ছে পুরোপুরি আমার। সে মাটি হচ্ছে আমার সংগ্রামী চেতনা। তাই স্বামী যদি সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধক হতেন আমার সৃষ্টিশীলতার পথে তাহলেও আমি লেখক হতাম। কারণ একটাই। সংগ্রামী চেতনা! শুধু সমর্থন, প্রেরণা কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসলে এতদূর পাড়ি দেয়া সম্ভব নয় যদি না নিজের ভেতর প্রতিভা না থাকে।

নিজের ভেতরে যে সাহিত্য বোধ-চেতনা কিংবা আগুন লুকিয়ে আছে সে শক্তিতেই এগিয়ে গেছি। সে সঙ্গে প্রচুর পাঠ অভ্যাস। যত না লিখি তার চেয়ে বেশি পড়ে থাকি। এছাড়া মানুষের প্রতি ভালোবাসা, বিশ্বাস, প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা আজও মন তাজা-সজীব রাখতে, মনের লাবণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। সে সঙ্গে আছে মাটি ও প্রকৃতির প্রতি অগাধ ভালোবাসা– বললেন মকবুলা মনজুর।

লেখালেখির ইচ্ছা নিয়ে মকবুলা মনজুর বলেন, পারিবারিকভাবেই লেখালেখির আবহ পেয়েছি। আমার রক্ত-জিনে লেখার নেশা আছে। বাবা লিখতেন। তিনি আত্মজীবনী লিখেছেন। ভাই মোখলেসুর রহমান প্রবন্ধ লিখতেন। চলচ্চিত্র পরিচালক ইবনে মিজান আমার ভাই। তার চলচ্চিত্রের কাহিনী, চিত্রনাট্য– সব নিজেই লিখতেন। ভাই আজিজ মেহের লেখালেখির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বোন মুসলিমা নোমানও কম বেশি লেখালেখি করতেন।

মকবুল মনজুরের 'শকুনেরা সবখানে' বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে। মোট ১০টি গল্প আছে এতে। ভিনদেশি পাঠকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছেন। এ বইটির অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি জানান, শকুনেরা সবখানে গল্পটি পেন ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখাটি পড়ে নিয়াজ জামান ভীষণ অভিভূত হন এবং ১০টি গল্প অনুবাদ করেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। এর রেশ ধরে আমাদের সাহিত্যে অনুবাদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে বলেন, আমরা যারা বাংলায় লিখছি, মোটামুটি ভালো বাংলা জানি তারা নিজের লেখা নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদের কাথা ভাবতে পারি না। অন্যদিকে যারা ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত, ভালো ইংরেজি জানেন তাদের অনেকেই আবার বাংলায় অপটু। ইংরেজি-বাংলা দুটিই সমান ভালো না জানলে, দুটি ভাষার ওপর সমান দক্ষতা না থাকলে, দুটি ভাষায় তুখোড় না হলে অনুবাদ করে সুবিধা হবে না। আক্ষরিক অনুবাদ কখনো পাঠকের অনুভূতিকে নাড়া দিতে পারে না। বাংলা একাডেমি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ভাষা ইনস্টিটিউটগুলো এগিয়ে আসতে পারে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এবং ইংরেজি বিভাগ যৌথভাবে এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসলে কিছুই হচ্ছে না। এক্ষেত্রে চিন্তার দৈন্যতা, নাকি উদাসীনতা– কোনটি বেশি সক্রিয় ঠিক জানি না।

মকবুলা মনজুরের লেখার পৃথিবী কেমন? কখানি তার বিস্তৃতি? পাঠকমাত্রই কৌতূহল থাকতে পারে এ নিয়ে। তাই তিনি বলেন, আমার চারপাশের পৃথিবী জগৎ যার ভেতরে আমি আছি, আন্দোলিত হচ্ছি, কখনো কিছু পাচ্ছি, কখনো বা হারাচ্ছি– এসব মিলেমিশেই আমার লেখালেখির জগৎ। এ জগতের মাটি, মানুষ, প্রকৃতি, গাছ, সবুজ, আকাশের নীল, পাখির ডাক, দুঃখী মানুষ, না খেতে পাওয়া মানুষ,

সুখী মানুষ, সমাজের যন্ত্রণা, সমাজের ভালোবাসা– এসব কিছুই আমার লেখার উপাদান। লেখার রসদ এগুলোর মাঝ থেকেই পাই আমি। তবে এক্ষেত্রে অনন্য এক শক্তি কাজ করে তা হচ্ছে কৌতূহল। এ কৌতূহল জীবনের প্রতি, নানান শ্রেণীর মানুষের প্রতি। তাই সব ধরনের জীবন ও মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার অপার আগ্রহ বেশি ক্রিয়াশীল আমার মধ্যে। ফলে যে কোনো জায়গায় গিয়ে চেনা সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে অচেনা অনেকের মাঝে, বিস্তীর্ণ পরিবেশে হারিয়ে যাওয়ার এক প্রগাঢ় মানসিকতা কাজ করে সব সময়। পুরনো ঢাকায় যখন ছিলাম, বস্তির কাছাকাছি গিয়েছি। জীবন দেখেছি। পরে যখন ধানমন্ডি চলে এলাম তখনো জীবন দেখেছি; তবে আরেক রূপে। ভিন্ন স্বরূপ তার। জীবনে জীবনে কত যে বৈপরীত্য তা বোঝা যায় না জীবনের কাছাকাছি না গেলে। আমাদের নগর জীবনের প্রতি পদে পদে মানবতা লাঞ্ছিত, ধর্ষিত ও বিপর্যস্ত হচ্ছে। আসলে আমরা যা দেখি, ওপর থেকে দেখি– ভেতর থেকে, গভীর থেকে দেখি না। তিনি বলেন, বঞ্চনা আমাদের দেশে চিরকাল। যুগ যুগ ধরে এ দেশের মানুষ একমুঠো ভাতের কাঙাল। চিরকাল এখানকার মানুষ বঞ্চিত-নিঃস্ব। মানুষের মাঝে এখন অনেক শ্রেণীভেদ। এর পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যদি প্রশ্ন করেন আমার দেশ নিয়ে আমি আশাবাদী কি না তাহলে কিছু বলতে পারি না। তবে আশাবাদী হতে চাই। এ দেশের মানুষ তার দেশকে ভালোবাসুক, মানুষকে ভালোবাসুক। ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত নির্বিশেষে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি গড়ে উঠুক– এমন একটি স্বপ্ন আমার গভীরে সব সময় লালন করি। তাই বুঝি দেশ ছেড়ে নিউজিল্যান্ড গিয়েছিলাম বসবাস করব বলে; কিন্তু ফিরে এসেছি। দেশ ও দেশের মানুষ ছেড়ে থাকতে পারিনি। এ জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত অনেক পেয়েছি, পাচ্ছি; তবু ফিরে এসেছি। এমনকি নির্বাসিত জীবনে দহন, হতাশা, যন্ত্রণা– সব আমার সত্তার গভীরে কাজ করলেও আমার লেখকসত্তাকে থামাতে পারেনি কোনোভাবেই।

তিনি বলেন, সমাজে আজ নষ্ট মানুষের দৌরাত্ম্য দেখে দুঃখ পাই; তবু বিশ্বাস হারাই না। কোনো অবস্থাতেই মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হারাতে পারি না। ভাষার জন্য সংগ্রাম, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করতে জানে যে দেশের মানুষ, সংগ্রামী চেতনায় যারা চিরউজ্জীবিত সে মানুষ কখনো নষ্ট হতে পারে না। একদিন না একদিন তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। এক শ্রেণীর মানুষের উচ্চাশা, লোভ এবং অসুস্থ ভাবনা কাজ করায় তারা তাদের সন্তানের ভেতরেও সুস্থ চেতনা সঞ্চারিত করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে লোভ-হিংসার বীজ বপন করছে। তাই তারা দু'পেয়ো মানুষ ঠিকই কিন্তু মানবিকতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে না। অতিরিক্ত বিলাসী জীবনের মোহে আমাদের সমাজ অনেকখানি বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে এসব অশুভ চিন্তার মানুষজন আজ তাদের সন্তানদের বলি দিয়ে তাদের অপকর্মের মাশুল দিচ্ছে। আবার অনেক মধ্যবিত্ত বা নিম্নধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা বিলাসী জীবন দেখে মোহগ্রস্ত হচ্ছে। স্বাভাবিক পথে সে জীবনের স্বাদ পেতে ব্যর্থ হয়ে নষ্ট পথের মধ্য দিয়ে তাদের পার্থিব জীবন পেতে চাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমার ভেতরে বিভূতি ভূষণের অপুর মতো একজন অপু আছে। অতি শৈশব থেকে এখন পর্যন্ত সে অপু সক্রিয়। ফুল থেকে ফড়িং, বিরাট মহীরুহ, সেখানে পাতার কাঁপন, পাখির ডাক, আলোর মাখামাখি– সব কিছুই নিবিড়ভাবে দেখতে ভালোবাসে এ অপু। যখন যেখানে গিয়েছি প্রকৃতিই আমাকে তার বুকে টেনে নিয়েছে। আসলে প্রকৃতি আমার বুকের ভেতরের জিনিস। তাকে দেখার জন্য আমাকে আলাদা করে সময় বের করার প্রয়োজন হয় না। মাটি, পৃথিবী, চারপাশের পরিবেশ– সব মিলিয়েই তো আমরা এবং আমি।

শৈশবে মুকুল ফৌজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। সে অভিজ্ঞতার আলোকে মকবুলা মনজুর বলেন, শিশুমানস বিকাশে, শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে আমাদের সময় শিশু সংগঠনের ভূমিকা ছিল অনেকখানি। বর্তমানে তেমন ধারা নেই বললেই চলে। বড় হয়েও যারা শিশু হতে পারেন না, শিশুদের সঙ্গে মিশতে জানেন না তারা শিশু সংগঠন পরিচালনা করবেন কীভাবে? প্রকৃত শিশু সংগঠন শিশুদের বুকে, তার হৃদয়ে আকাশের বিস্তার ঘটায়, প্রকৃতিকে চিনতে শেখায়, মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। শিশুতে-শিশুতে বন্ধুত্বের পরিবেশ তৈরি করে, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগিয়ে তোলে।

লেখক-পাঠক, লেখক-প্রকাশক সম্পর্কের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মকবুলা মনজুর বলেন, এক সময় মুক্তধারা প্রতি বছর চৈত্র মাসে লেখকের যা প্রাপ্য তা বুঝিয়ে দিত। হালে গণস্বাস্থ্য প্রকাশনীর কাছ থেকে এমন সৌজন্যতা পেয়ে থাকি। এছাড়া আর অন্য কোনো প্রকাশকের কাছ থেকে সেভাবে সাড়া পাই না। তাই আমাদের দেশে পেশা হিসেবে লেখাকে বেছে নেয়া খুবই কঠিন, অসম্ভবই বটে! এছাড়া আমাদের দেশে পাঠকই বা কোথায়? ক'জনই বা বই পড়েন! আর সামান্য দু'একজন যারা পড়েন তাদের মধ্যে কিনে বই পড়েন ক'জন? আসলে আমাদের মধ্যে বই পাঠে যেমনি, বই কেনারও তেমনি অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। ঈদের বাজারের জন্য বড় অংকের বাজেট থাকে প্রতিটি শিক্ষিত-ধনাঢ্য পরিবারে; কিন্তু সামান্য একটি ঈদ সংখ্যা পত্রিকার জন্য বাজেট থাকে না। একুশের বইমেলাকে ঘিরে প্রতিটি শিক্ষিত পরিবারে বাজেট হওয়ার কথা; কিন্তু তেমনটি নেই। আমাদের দেশে এখনো অনেক তরুণ বাবা-মা আছেন যারা তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে বই পড়ার শিক্ষা পাননি। ফলে তাদের চেতনায় বই পড়ার স্বভাব গড়ে ওঠেনি। তাই এসব তরুণ বাবা-মা তাদের সন্তানের হাতে বই তুলে দিচ্ছেন না, বইবিমুখ করে তাদের গড়ে তুলছেন; কিন্তু তারা জানেন না ভালো পাঠক তৈরি না হলে ভালো মানুষ হওয়া যায় না। তবে আমি আশাবাদী, একদিন এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। অনেক তরুণ বাবা-মা যেমনি বই পাঠে আগ্রহী হবেন তেমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের সন্তানের হাতেও বই তুলে দেবেন। তখন সুস্থ-সুন্দর এবং সৎ চিন্তার মানুষ আমাদের সমাজে বেশি দেখা যাবে। সেদিনটি হবে সত্যি সুখের এবং মধুময়! ●

ছবি : মোস্তাফা আজিজি

প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

আর এক জীবন (১৯৬৮), অবসন্ন গান (১৯৮২), বৈশাখে শীর্ণ নদী (১৯৮৩), জল রং ছবি (১৯৮৪) আত্মজ ও আমরা (১৯৮৮), পতিতা পৃথিবী (১৯৮৯) প্রেম এক সোনালি নদী (১৯৮৯), শিয়রে নিয়ত সূর্য (১৯৮৯) অচেনা নক্ষত্র (১৯৯০), কনে দেখা আলো (১৯৯১), নির্বাচিত প্রেমের উপন্যাস (১৯৯২), নদীতে অন্ধকার (১৯৯৬), লীলা কমল (১৯৯৬), কালের মন্দিরা (১৯৯৭), বাউল বাতাস (২০০১), ছায়া পথে দেখা (২০০২), একটাই জীবন (২০০৪)।

গল্প সংকলন : সায়াহ্ন যূথিকা (১৯৭৮), শকুনেরা সবখানে (১৯৮৮), নক্ষত্রের তলে (১৯৮৯), মকবুলা মনজুরের প্রেমের গল্প (১৯৮৯), একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প (১৯৯১), দিনরজনী (১৯৯৩), কৃষ্ণপক্ষ (২০০৫)।

অনুবাদ গ্রন্থ : পঞ্চকন্যা (পাঁচটি আমেরিকান গল্পের বাংলা অনুবাদ) (১৯৬৪), The Vultures are Every Where (২০০৫), ১১টি বাংলা ছোট গল্পের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ।

কিশোর উপন্যাস : ডানপিটে ছেলে (চলচ্চিত্রায়িত ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত) (১৯৮৮), কাঞ্চন জঙ্ঘা এক্সপ্রেস (১৯৮৮), মহেশখালিতে মুকুট (১৯৯০), সাহসী ছেলে (১৯৯১), দুরন্ত মুকুট (১৯৯৬), আকাশ ভরা গান (১৯৯৬), সোনার ঝাঁপি (২০০১), সূর্যের অধিকার (১৪০০ বাংলা), গ্রামের নাম ফুলতলী (২০০৫), কিশোর উপন্যাস সমগ্র (২০০৫), কিশোর মহাভারত (ক্ল্যাসিক) (১৯৮৭)।

গল্প সংকলন : রঙিন মাছ (১৯৮২), অপূর্ব উপহার (১৯৮২), নদীর ওপারে মেলা (১৯৮৬), সূর্য কিশোর (১৯৮৮), নির্বাচিত কিশোর গল্প (১৯৮৯), ছোট ছোট রূপকথা (১৯৮৯), স্বপ্নের গোলাপ (১৯৯১), বনের পাখি চন্দনা (২০০৪), বিদেশী রূপকথা (২০০৫), দেশে দেশে (ভ্রমণ কাহিনী) (২০০৫)।

প্রবন্ধ সংকলন : জীবন ও সাহিত্য (১৯৯৩)।

জীবনী গ্রন্থ : ছোটদের মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯৯৩)।

পুরুস্কার : শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার হিসেবে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৪), কথাসাহিত্যে কমর মুশতারী পুরস্কার (১৯৯০), রাজশাহী লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৯৩), জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থগার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পুরস্কার (১৯৯৭), নন্দিনী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০০৫)।

জীবন সদস্য : বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশে ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন ও এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ।

সদস্য : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি (সদস্য), সহ-সভাপতি নিজেরা করি (এনজিও), উপদেষ্টা বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ।